জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১০, সংখ্যা-২, জুলাই–ডিসেম্বর ২০২০

সৈয়দ শামসুল হকের গল্পে জলেশ্বরীর জীবনভাষ্য : বিন্দু থেকে বৃত্ত

শিল্পী খানম*

Abstract

Syed Shamsul Haq (1935-2016) emerged as a short story writer in the 50s. He was simultaneously a poet, playwright, novelist and prose writer. He had dominant movement in every branch of literature. His artistic mindset grew up in the context of the social and political transmission after partition of India. Both the pastoral setting and urban life have received accommodation in his stories. With profound insight, he observed the long social, political, economic and cultural reality of this country. In addition to the disparity, poverty, superstition, dirty politics, religious dogma and shrine business of the rural life, the contemporary politics and the memorable war of liberation have obtained a special place in many of the stories written by him. Jaleshwari is basically a place in Kurigram where he was born and spent his childhood and adolescence. Kurigram and its people have a special place in the core of his heart .

বাংলাদেশের ছোটগল্প রচনায় যারা অপরিসীম কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬)। লেখক হিসেবে তিনি নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির রূপকার অভিধায় খ্যাতিমান। নগরজীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা, ক্লেদ, বীভৎসতা, নানাবিধ সমস্যা, কদাকার, ভ্রষ্টাচার, রাজনীতি, সামাজিক সমস্যা প্রভৃতি জীবনের রূঢ় বাস্তবতা তাঁর ছোটগল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। অবশ্য নগরজীবনের ঢেউ গ্রামজীবন নির্ভর বাংলাদেশের প্রান্তিক জীবনকে যে নাড়া দেয়নি, এমন বলা যাবে না। তাই দেখা যায়, সৈয়দ শামসুল হকের ছোটগল্পে বাংলাদেশের নগরজীবন যেমন তার বহুমুখী জীবন জটিলতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, তেমনি পরিবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ জীবনও তার যুগোপযোগী সমস্যা নিয়ে অবলীলায় সেখানে স্থান করে নিয়েছে। তাঁর রচিত *প্রাচীন বংশের নিষ্ণস্ব সন্তান* (১৯৮১) ও *জলেশ্বরীর গল্পগুলো* (১৯৮৯)- এই দুটি গ্রন্থে উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ জনপদের মানুষের ইতিহাস-ঐতিহ্য, কিংবদন্তি, উপকথা, লোকশ্রুতিসহ তাদের সংগ্রামশীল জীবনের বৈচিত্র্যময় চিত্র পাওয়া যায়। তাঁর গল্পে মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতাউত্তর রাজনেতিক পটপরিবর্তন, সামরিক শক্তির উত্থান, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পুনর্বাসন অর্থাৎ স্বৈরশাসনের করাল থাবায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন স্বদেশের সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং দারিদ্র্যের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের গ্রামজীবন নিয়ে গল্প রচনার ধারাটি বেশ পুরানো। আমাদের গ্রামনির্ভর ছোটগল্পের শাখাটি অনেক সমৃদ্ধ। আবু ইসহাক, (১৯২৬-২০০৩), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৯) ও হাসান আজিজুল হকের (জন্ম ১৯৩৯) গল্পে গ্রামীণ জীবনের দারিদ্র্য, হাহাকার, বঞ্চনা আর নিপীড়নের ছবি স্থান পেয়েছে। উক্ত লেখকদের অনেকে শ্রেণিসচেতন গণমুখী চেতনার আদর্শবাহী। তবে সৈয়দ হক বিশেষ কোনো দর্শন অর্থাৎ বামপন্থী চেতনার লেখক ছিলেন না। হাসান আজিজুল হকের গল্পে উত্তরবঙ্গ ও রাঢ়বঙ্গের গ্রামীণ জীবনের সামাজিক শোষণ, দারিদ্র্যক্লিষ্ট সম্প্রদায়ের সংগ্রামী জীবনের রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করা যায়। বস্তুবাদী সমাজচিন্তায় উজ্জীবিত শওকত আলী শ্রেণি-সচেতনতার আলোকে নির্মাণ করেন সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের নির্মম শোষণের চিত্র, বঞ্চিত মানুষের হাহাকার, ও তাদের উত্তরণের জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। সৈয়দ শামসুল হক অবশ্য তাঁর গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে রচিত গল্পগুলোতে উত্তরবঙ্গের মঙ্গা-পীড়িত জনগোষ্ঠীর জীবনের স্বরূপ উন্মোচন করেন বটে, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ কোনো লড়াই সেখানে অনুপস্থিত। তিনি সমাজের রক্ষণশীল সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী, মৌলবাদীশ্রেণি, সুবিধাবাদী শ্রেণি, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অসাধু রাজনীতিবিদ ও মহাজন-জোতদার এদের

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মুখোশ উন্মোচন করেছেন। গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত তাঁর গল্পসমূহকে বিষয়বস্তুর আলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন :

(ক) ঔপনিবেশিক শাসনামলের সংগ্রামী ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষকবিদ্রোহ ফুটে উঠেছে যে সব গল্পে তা হলো – 'প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান', 'নেপেন দারোগার দায়ভার'।

(খ) মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের চিত্র যে সব গল্পে পাওয়া যায় তা হলো – 'আজাহারের মাতৃশোক', 'জলেশ্বরীর দুই সলিম', 'ভালো করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে', 'জারজ'।

(গ) বাংলাদেশের সামরিক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির রূপায়ণ ঘটেছে যে সব গল্পে তা হলো 'নেয়ামতকে নিয়ে গল্প নয়', 'জমিরউদ্দিনের মৃত্যু বিবরণ', 'সোনার মা বর্গুন বিবি'।

(ঘ) ধর্ম ও সমাজের বিরোধ অর্থাৎ ধর্মাশ্রয়ী গল্পে জীবনবাস্তবতার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে যে সব গল্পে তা হলো– 'কোথায় ঘুমোবে করিমন বেওয়া', 'যারা বেঁচে আছে', 'আরো একজন', 'জীবিতের ভয়' প্রভৃতি।

(ঙ) বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় অভাব-দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের ছবি চিত্রিত হয়েছে যেসব গল্পে তা হলো– 'সাহেব চান্দের ঈদ ভোজন', 'শরবতীর পাশ ফেরা', 'মনোহরকে পাওয়া যাচ্ছে না', 'পূর্ণিমায় বেচাকেনা'।

(চ) নারীর প্রতি সহিংসতার চিত্র পাওয়া যায় 'যেন বা এক মহামারী থেকে' গল্পটিতে।

(ক) ঔপনিবেশিক শাসনামলের সংগ্রামী ইতিহাস-ঐতিহ্য ও কৃষকবিদ্রোহ :

সৈয়দ শামসুল হক রচিত 'প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান' গল্পে উপনিবেশ আমলের মহাজনী প্রথার কুফল ফুটে উঠেছে। একই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের রংপুর অঞ্চলের গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-সংগ্রামের কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে। মঙ্গাপীড়িত অঞ্চলে মহাজন শ্রেণির দাপট ও শোষণের স্বরূপ গল্পের কেন্দ্রানুগ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত। চৈত্রের প্রচণ্ড দাবদাহে তৃষ্ণার্ত গল্প কথকের এক বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। কথক জলেশ্বরী থেকে মান্দারবাড়ি পর্যন্ত গ্রামের পথে হেঁটে দেখেছেন প্রকৃতির রুদ্ররোষ ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে বসবাসরত মানুষের আর্থিক ভগ্নদশার চিত্র। গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত সুদখোর মহাজন ও জোতদার শ্রেণির কাছে অভাবীরা তাদের সহায় সম্বল সব বিক্রি করে দেয়। সুজলা-সুফলা নয়, জোতদার-মহাজনের শোষণে এবং খরায় ছিন্নভিন্ন গ্রামীণ জনপদের চিত্র লেখক এভাবেই তুলে ধরেছেন :

> এ এমন এক মরুভূমি যেখানে মানুষ দিনান্তে এক মুঠো অন্নও সংগ্রহ করতে ব্যর্থ, কারণ কয়েক বছর যাবৎ চলছে নিদারুণ খরা; এ এমন এক মরুভূমি যেখানে মানুষ তার শেষ জমিটুকু পর্যন্ত বিক্রি করে ফেলেছে, তার শেষ বিক্রয়যোগ্য বস্তুটি পর্যন্ত বাঁধা দিয়ে ফেলেছে, তার শেষ বিক্রয় চালাটিকে পর্যন্ত খসে খসে পড়তে দেখেছে[১]।

'প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান' গল্পে লেখক এক ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত পরিবারের নিঃস্ব সন্তান দেওয়ান ইদ্রিস খাঁর জীবনের ঘটনাগুলোকে সকৌতুকে বিবৃত করেন।'[২] গল্পের দেওয়ান ইদ্রিস খাঁ নামক এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তিকে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ করালগ্রাসে সমস্ত কিছু বিক্রি করতে হয়েছে, কিন্তু একমাত্র স্মৃতি হিসেবে তিনি বংশগতভাবে প্রবহমান ঐতিহ্যের চিহ্ন প্রাচীন নকশা ও কারুকাজ করা রূপোর গ্লাসটি হাতছাড়া করেননি:

> দুশত বছর আগে এই অঞ্চলে ফৌজদার ছিলেন তার উর্ধ্বতন পুরুষ এবং সেই স্বচ্ছল অতীতের স্মারক হিসেবে এখনো হুজুর সাহেবানের খাশ গেলাশটি বংশ পরম্পরায় তারা রক্ষা করে এসেছেন। শুধু কোন পথিক এসে পানি চাইলে কেবল গ্লাসটি ব্যবহারের জন্য বের করেন।

'প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান' গল্পে রংপুর অঞ্চলের দারিদ্র্যের চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে গভীর ভাবে।'[৩] এদেশে ক্রীতদাস প্রথা বহু আগেই বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই সত্য যে, মহাজন

চণ্ডিবাবুর বকেয়া সুদের টাকা পরিশোধ করতে গল্পে ইদ্রিস খাঁ মহাজনের কাছেই নিজেকে বিক্রি করে দেয়: 'আর কিছু বিক্রির ছিল না। ছিল এই দেহ, এই দেহ আমি মহাজনের কাছে বিক্রি করি নগদ এক হাজার টাকায়।' এক সময় মাইনর স্কুলের মাস্টার এখন নিঃস্ব ভূমিহীনে পরিণত হয়ে চণ্ডিবাবুর গাড়োয়ানে রূপান্তরিত হয়। প্রৌঢ় ইদ্রিস খাঁকে অবশেষে মহাজন চণ্ডিবাবুর দাসত্ব থেকে ভোলা মাস্টার কৌশলে উদ্ধার করে। ভোলা মাস্টার এই অঞ্চলের তেভাগা আন্দোলনের নেতা ছিলেন। 'ভোলা মাস্টার চরিত্রের উল্লেখের মধ্য দিয়ে লেখক চল্লিশের দশকের ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের ঘটনাকে উপস্থাপন করেছেন- যা ছিল বঙ্গদেশের বর্গা বা ভাগাচাষীদের রক্তক্ষয়ী এক সংগ্রাম।'[৪] ব্রিটিশ আমলে এদেশের সাধারণ বর্গাচাষীরা জমিদার, মহাজনদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। ভূমিজ শ্রেণির অধিকার আদায়কারী সংগ্রামশীল ভোলা মাস্টার একটি প্রতীক চরিত্র; 'গল্পে এই ভোলা মাস্টারের চরিত্রটি বিস্তৃত নয়, স্পষ্টত বোঝা যায় এটি একটি প্রতীকী চরিত্র মাত্র- যিনি মুক্তির দূত, যিনি মানুষকে পরাধীনতা থেকে, শৃঙ্খল থেকে মুক্তির পথনির্দেশ দিতে পারেন।'[৫]

ঔপনিবেশিক আমলে এদেশে শোষিত-বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষ ব্রিটিশবিরোধী নানা আন্দোলন সংগ্রাম করেছে। সৈয়দ শামসুল হক রচিত 'নেপেন দারোগার দায়ভার' গল্পের প্রেক্ষাপটে রয়েছে কৃষক বিদ্রোহের রক্তাক্ত ইতিহাস। আধকোশা নদীর তীরবর্তী কাঁঠালবাড়ি গ্রামের বীরসন্তান কৃষক আন্দোলনের কর্মী বিপ্লবী দেবেশ রায়ের পুলিশি নির্যাতনে হাজত খানায় মৃত্যু ঘটে। এই নির্মম মৃত্যুর ঘটনা গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে ভীত সন্ত্রস্ত গ্রামবাসী অগ্নি সংযোগের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ প্রশাসনের ভয়ে জনশূন্য কাঁঠালবাড়ি গ্রামের শোকাবহ ও আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থা লেখক এভাবেই বর্ণনা করেছেন:

> অন্ধকারে কোনো আলো চোখে পড়ে না কোথাও। বাতাসে কোনো ধ্বনি স্বর ভেসে আসে না। সন্ধ্যার মঙ্গল শাঁখ বাজে না। আজান শোনা যায় না।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বেলসাহেবের নির্দেশে দেবেশের লাশ কাঁঠালবাড়ি শ্মশানঘাটে দারোগা নিজের তত্ত্বাবধানে দাহ করার উদ্যোগ নেয়। বৃহৎ ক্ষমতাধর প্রশাসনের সঙ্গে নিরীহ নিরস্ত্র কৃষক সম্প্রদায়ের এই আন্দোলন যে শুধু অসম শক্তির লড়াই ছিল, সেটাই ফুটে উঠেছে নেপেন দারোগার খেদোক্তিতে:

> শালা আন্দোলন করেগা, চাষিকো সমান ভাগ দেগা, আংরেজ কো, হঠা দেগা, গরিব কা রাজ হোগা, বহৎ দরদ দেখা নেওয়ালা থা। আব কাঁহা হ্যাঁয় সব? লাশ তো ওহি আংরেজ কো আভি দাহ করনে পড়ে গা। হ্যাঁ

নদীর তীরে লাশের কাছে অন্ধকারে হঠাৎ কান্নার ধ্বনি শুনতে পেয়ে দারোগা আশ্চর্য হয়ে যায়। দেবেশের বৃদ্ধা মাতার আর্তনাদে ও অভিশাপে নেপেন দারোগার সমস্ত অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে; আত্মদানকারী এই দেবেশ বিপ্লবীদের অকুতোভয় প্রাণশক্তির উৎস : 'তার কেবলই মনে হচ্ছে বুড়ির পেছনে পেছনে এক্ষুণি, এই মুহূর্তে শত শত লোক রে- রে করে বেরিয়ে আসবে হাজার মশাল জ্বালিয়ে। কেড় নেবে লাশ।' সংগ্রামী জনতার অনুপ্রেরণা শক্তি এই দেবেশ। গল্পের সমাপ্তিতে দারোগা কর্তৃক মুখাগ্নির মধ্য দিয়ে বিপ্লবীদের প্রতি এক ধরনের সহমর্মিতা ও সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের মুক্তির সংগ্রামে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগের কাহিনি বর্ণনায় গল্পটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত।

(খ) মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের চিত্র :

'আজাহারের মাতৃশোক' গল্পের পটভূমিতে আছে মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবান্বিত ইতিহাস। আজাহার একদিন শহরে যাত্রা দেখতে গিয়ে জুয়ার আসরে তিন দিন কাটিয়ে বাড়ি ফিরে দেখতে পায় তার জন্মদাত্রী আর বেঁচে নেই। এ খবর শুনে সে ঘরের চৌকাঠের পরেই পাথরের মতো স্থির হয়ে থাকে। জননীর শোকে ব্যাকুল আজাহার যেন বৃক্ষে পরিণত হলো। এ প্রসঙ্গে কথক বলেছেন:

> ও আজহার, তুমি আর কেঁদো না। এ কেমন করে তুমি কাঁদো? তোমার কান্না যা আমরা আর বহন করতে পারি না। কত দীর্ঘ দিন থেকে তুমি কাঁদছ। আজাহার, মিনতি করি, তুমি কেঁদো না। এত কান্না জগত বহন করতে পারে না।

'আজাহারের মাতৃশোক' গল্পের আরেক প্রান্ত আজাহারের দেশপ্রেম। গাঁয়ের ছেলে আজাহারের অগাধ মাতৃভক্তি রূপান্তরিত হলো যুদ্ধাক্রান্ত শত্রুবেষ্টিত দেশমাতৃকার ওপর। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যখন সবাই পাকিস্তানী মিলিটারির ভয়ে গ্রাম ছেড়ে সীমান্তের ওপারে ভারতে চলে যায়, তখনও মাতৃশোকে বিহ্বল আজাহার ভাবলেশহীন ছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময় ভেলাপোকা গ্রামে মিলিটারি এসে অগ্নিসংযোগ, হত্যা ও গর্ভবতী নারীকে নির্যাতন করলে পাকবাহিনীর বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয় আজাহার। দখলদার বাহিনীর চারজন মিলিটারিকে হত্যা করে নিজেও শহিদ হয়। যুদ্ধ শেষে গাঁয়ে ফিরে এসে এলাকার লোকজন আজাহারের বাড়িতে উপস্থিত হলে তার আত্মত্যাগের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে:

> অচিরে আমাদের চোখে পড়ে, তার পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে কিছু কঙ্কাল, মানুষের কঙ্কাল, মনে হয় মানুষ ছিল চারজন, তাদের আশপাশে কয়েকটা রাইফেল পড়ে আছে ঘাস প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে তাদের নল, বাঁট, গুলির ফিতা আর কংকালের গায়ে খাকি কাপড়ের কিছু অংশ এখনো বোঝা যায়, আর দেখা যায় কাঁধের কাছে পেতলের চাঁদতারা কয়েকটা।

আজাহার দেশপ্রেমিক এক বীরযোদ্ধা, মাতৃশোক ভুলে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শোককে শক্তিতে পরিণত করে গ্রামের এক সাধারণ যুবক শত্রুর বিরুদ্ধে নিপীড়িত-নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে: 'মানুষেরা কি সংগ্রামের কালে তবে এমনি করে এক মা থেকে আরেক মায়ের দিকে, আমাদের সবার মায়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে থাকে'। গল্পে আজাহার ব্যক্তির সীমা অতিক্রম করে স্বদেশ ভূমির মধ্যে অনুভব করেছে তার মাতৃরূপ; ব্যক্তিক শোক কাটিয়ে সে সামষ্টিক চেতনায় জেগে ওঠে:

> ও আজাহার, তোমারই বা একি পরিবর্তন আমরা দেখি? তুমি তো তোমার মায়ের এই ঘরের ভেতরে শূন্যতার দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে ছিলে দিনের পর দিন . . . কখন তুমি গ্রামের দিকে চোখ ফেরালে?

'জলেশ্বরীর দুই সলিম' গল্পে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির পুনরুত্থানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর এদেশের রাজনীতিতে পুনরায় পাকিস্তানপন্থী শক্তির দাপট বেড়ে যায়, বিশেষত ১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর এ জাতীয় অশুভ শক্তির রাজনীতির অঙ্গনে প্রতিষ্ঠা গল্পের প্রেক্ষাপটে রয়েছে। তবে লেখক স্মৃতিময়তায় মুক্তিযুদ্ধকালীন জলেশ্বরীর ঘটনাবলিও বর্ণনা করেছেন। মূলত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা গল্পের মূল বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এ কারণে কথক মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ম্লান হওয়ায় আক্ষেপ করে বলেছেন:

> জলেশ্বরীর রাস্তাঘাট এখন একাত্তরের শহীদদের নামে নেই, যেমন ষোলই ডিসেম্বরের পর কিছুদিন ছিল; শহীদদের জন্যে তোলা মিনারটি এখনো আছে কিন্তু তার চারপাশ ঘিরে নানা রকমের দোকান, অবশ্য প্রতি বছরই ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি কয়েকদিনের জন্যে দোকানগুলো সরে যায়।

'জলেশ্বরীর দুই সলিম' গল্পে জলেশ্বরীর জনসভায় পাকিস্তানপন্থী এক হুজুর বক্তৃতা শেষে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি প্রদান করে বক্তব্য সমাপ্ত করে। এ সময় উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে এর প্রতিবাদে একজন বলে ওঠে 'ধর শালাকে'; অবশ্য এর কিছুক্ষণ পর দেখা যায় ভীড়ের মধ্যে কেউ সেই হুজুরের ডান কানটি কেটে নিয়ে যায়। এ ধরনের কাজের জন্য অপরাধী হিসেবে এলাকার দুই সলিম অর্থাৎ হাবা সেলিম ও ভুখা সেলিমকে দায়ী করা হয়। তাদের পুলিশ ধরে জেল হাজতে প্রেরণ করে, কিন্তু তারা এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয় বলে জানিয়েছে। অবশ্য তাদের দারিদ্র্য ও বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে কেউ তাদের দিয়ে একাজ করাতে পারে বলে অনুমান করা হয়। গল্পে গ্রামীণ নিম্নবর্গের দিনমজুর দুই সলিমের নাম বিভ্রান্তির সূত্রে লেখক উন্মোচন করেছেন একাত্তরের রাজাকার প্রসঙ্গ, নারী নির্যাতন, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব এবং একই সঙ্গে স্বাধীনতা-পরবর্তী নব্য পাকিস্তানপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের আস্ফালন। গল্পকথক

সালমা নামের বিভ্রান্তির সূত্রে বর্ণনা করেছেন রাজার হাটের রাজাকারদের প্রসঙ্গ। রাজারহাট কলেজের অধ্যাপক যিনি সালমাকে বিয়ে করতে বাধ্য হন, সেই সালমা ছিল স্থানীয় স্বাধীনতাবিরোধী শান্তি কমিটির প্রেসিডেন্ট দেওয়ান খাঁর কন্যা। গল্পে জলেশ্বরীর সাহসী বীর সন্তানদের মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার লোকশ্রুতিও উল্লেখ রয়েছে। হাসনা নামের দুই রমণীকে নিয়ে বিভ্রান্তির সূত্রে গল্পে এসেছে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের প্রসঙ্গ এবং একই সঙ্গে এই অঞ্চলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য:

> মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের এই অঞ্চলে তিন জনের নাম শোনা গিয়েছিল, পাকিস্তানী মিলিটারিদের বড় জব্দ তারা করেছিল, মজহার, আকবর হোসেন আর মহিউদ্দিন। মহিউদ্দিন খোদ জলেশ্বরীর ছেলে, এখানে যে হজরত শাহ সৈয়দ কতুবউদ্দিনের মাজার আছে, সে তাঁহারই বংশধর। আকবর হোসেনের বাড়ি আধকোশা নদীর উত্তরে মন্দারবাড়ি, এককালে রাজা প্রতাপচন্দ্র রায়ের রাজধানী ছিল এই মন্দারবাড়ি, এখনো রাজবাড়ির ভাঙ্গা পাঁচিল অনেকখানি আছে।

গল্পে ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নারী নির্যাতনের ঘটনা উল্লেখ আছে। জলেশ্বরী হাই স্কুলের নতুন হেড মাস্টার তাহেরের স্ত্রী ঢাকায় পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে ধর্ষিত হবার পর আত্মহত্যা করেন। 'জলেশ্বরীর দুই সলিম' গল্পে কলেজ ছাত্রী চেমন আরাকে প্রেম নিবেদন করে লেখা চিঠির প্রেরকের নাম যখন পাওয়া গেল আবদুস সাত্তার তখন সেই আবদুস সাত্তার নামের বহু ব্যক্তির সূত্রে গল্পে এসেছে রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার ও রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রসঙ্গ :

> দুঃখের কথা কি বলব, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির নামও আবদুস সাত্তার। সৈনিক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে সৈন্যদের হাতে নিহত হবার পর বিচারপতি আবদুস সাত্তার পদাধিকার বলে রাষ্ট্রপতি হয়েছেন।

আলোচ্য গল্পে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে স্বাধীনতার পক্ষ শক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি যাতে স্বাধীনতার চেতনা ভূলুণ্ঠিত করতে না পারে তার জন্যে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তিকে সজাগ থাকতে হবে। স্বাধীনতার পক্ষ শক্তির সম্মিলিত প্রয়াসে পরাজিত হবে বিরোধী শক্তি। গ্রামবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আইনি সহায়তা দিয়ে দুই সলিমকে জেল থেকে মুক্ত করা হয়। এ প্রসঙ্গে গল্পের শেষাংশ উল্লেখ্য :

> ধর সলিম এবং কাট সলিম। ঐ পাকিস্তান জিন্দাবাদ ব্যক্তিটির কান আসলেই কেটে ছিল কিনা আমরা জানি না। আমরা কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করি, কাজটির প্রশংসা তারা গ্রহণ করতে আর অনিচ্ছুক নয় এবং তারা এখন এই বাক্যটিও বলতে মোটেই ক্লান্ত নয় যে, এই রকম মিলেমিশে কাজ করতে না পারলে আমাদের আর রক্ষা নেই।

'জলেশ্বরীর দুই সলিম' গল্পে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অপশক্তির দৌরাত্ম্য এখানে খুব স্পষ্ট হয়েছে হুজুর চরিত্রের মধ্য দিয়ে। এই শ্রেণিচরিত্র প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> 'জলেশ্বরীর দুই সলিম' গল্পে জলেশ্বরীর এক সভায় হুজুরের 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি প্রদানের ঘটনা এদেশে মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী পাকিস্তানের তল্পিবাহক ধর্মান্ধ মৌলবাদ চক্রের ধৃষ্টতা ও আস্ফালনেরই প্রতিফলন। গল্পের হুজুর চরিত্রটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী নব্য পাকিস্তানপন্থী গোঁড়া প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর প্রতিনিধি।'[৬]

সৈয়দ শামসুল হক বিশেষ কোন দর্শনের দ্বারা পরিচালিত না হয়েও বাস্তবতাকে গল্পে রূপদান করেছেন। তাঁর রচিত 'ভালো করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে' গল্পে সমকালের সমাজবাস্তবতায় মানুষের কাছে নতুন এক মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার আগামবার্তা ধ্বনিত হয়েছে। এখানে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের অস্থির সমাজব্যবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। গল্পে মান্দার বাড়ির এক রমজানের মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মসজিদের দরজার কাছে অস্ত্রধারী দুজন যুবককে দেখে ইমাম সাহেবের

মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঘটনা স্মরণে আসে। ১৯৭১ সালের রমজান মাসের এক রাতে দুজন মুক্তিযোদ্ধা এসে মসজিদ থেকে শান্তি কমিটির পাঁচজন সদস্যকে ধরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করেছিল। ইমাম সাহেবের স্মৃতিতে এখনও জ্বলজ্বল করছে মান্দারবাড়ির বীর মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেনের সেই কৃতিত্ব:

> তবে সেই মুক্তিযোদ্ধা এদের একজন হয়ত আকবর হোসেন যে আকবর হোসেন মান্দারবাড়ি ঢুকবার মুখেই অশত্থ গাছের ডালে তিনদিন তিনরাত অপেক্ষা করেছিল এবং তিন দিনের পরে সেই অশত্থের নিচে যখন বিশ্রাম নিতে বসেছিল পাকিস্তানি সৈন্যরা, একা সে তাদের প্রত্যককে খতম করেছিল বহু বছর আগে, রমজান মাসের সেই রাতে, সেই যুবক দুটি ধরে নিয়ে গিয়েছিল পাঁচটি মানুষকে।

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে কয়েক বছরের ব্যবধানে সেই মসজিদে তারাবি নামাজ শুরু হলে ইমাম সাহেব আগত অস্ত্রধারী দুজন যুবককে একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধার প্রতিনিধি মনে হয়। স্বাধীনতা উত্তর সমাজে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। মসজিদের মতো পবিত্র স্থানে প্রকাশ্যে সশস্ত্র দুই যুবককে দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত মুসল্লিদের মনে নানা ভাবনার উদয় হয়; যা সমকালের অস্থির সমাজ ব্যবস্থার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়:

> কেউ ধাওয়া করে আসছে; এদের একজনের স্মরণ হয় এক যুবতীকে খুন করে গাছে ঝুলিয়ে রাখবার কথা, আরেকজনের স্মরণ হয় রিলিফের গম বিক্রি করে দেবার কথা, অপর একজনের স্মরণ হয় জমি আত্মসাৎ করে একটি পরিবারকে গ্রামছাড়া করবার কথা এবং আরেকজনের স্মরণ হয় দেশের সর্বাধুনিক রাজনৈতিক দলের মান্দারবাড়ি শাখা স্থাপন করবার কথা।

ইমাম সাহেবের কাছে মসজিদে আগত বন্দুকধারীদের পরিচয় স্পষ্ট হয় না; তারা কোন কথাও বলে না। ইমাম সহেব যখন বলেন, 'কন, বাহে, শুনি হামরা। মুক্তিযুদ্ধ কি ফির শুরু হয়া গেইছে?' কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া যায় না। স্বাধীনতার-উত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সে মৌলিক পরিবর্তন জনসাধারণের প্রত্যাশিত ছিল; সেটি রাষ্ট্রনৈতিক ব্যর্থতার ফলে সম্ভব হয় নি। ফলে সদ্য স্বাধীনদেশে সীমাহীন নৈরাজ্য দেখে জনসাধারণের কাছে প্রাপ্ত মুক্তির স্বাদ প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। তাইতো তারা এই রুদ্ধ অবস্থা থেকে কাঙ্ক্ষিত মুক্তির প্রত্যাশা করেছে।

সৈয়দ শামসুল হক তাঁর 'জারজ' গল্পে স্বাধীনতা পরবর্তী দেশে তীব্র খাদ্যাভাবের দিকটি তুলে ধরেছেন। জলেশ্বরীর আজমলের পোয়াতি স্ত্রী পারুলের জন্য রুই মাছ ক্রয় প্রসঙ্গে এসেছে অনাগত সন্তানের জন্য খাদ্য সংস্থানের প্রসঙ্গ, যা মূলত দেশের খাদ্য সংকটের ইঙ্গিত বহন করে :

> দ্যাশের মানুষ খিদায় জ্বলিয়া পুড়িয়া কয়, খাদ্য দাও, অন্তর হতে এই চিৎকার ওঠে, সেই চিৎকার কি দেশবাসী শোনে? জলেশ্বরীর মানুষ সেই কতকাল হতে, সেই ব্রিটিশের আমল হতে আকালের ভিতরে, মঙ্গার ভিতরে। এত যে স্বাধীন করিলেন দ্যাশ, জলেশ্বরীর মাটির মা আইজও কান্দে, শত বছরের ভোগ হামার, খাদ্য দাও, মা।

আজমলের বাবাও এক সময় অভাবের তাড়নায় জামগাছের ডালে গামছা গলায় বেঁধে আত্মহত্যা করেছিল। 'জারজ' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের ভিন্নধর্মী অনুষঙ্গ আছে। গল্পকার মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক ধর্ষিত হওয়ার ফলে যে সব বাঙালি নারী গর্ভধারণ করেছেন, তাঁদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। বীরাঙ্গনারা নির্যাতিত হয়েছেন দেশের জন্য, তাঁদের প্রতি লেখক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এদেশের আলো বাতাসে বড় হয়ে যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অস্বীকার করতে চায়, তাদেরকে লেখক ঘৃণা করে জারুয়া (জারজ) বলেছেন:

> জারুয়া সন্তান কি জারুয়া নয়, সেটা কোনো কথা নয়। দ্যাশে আইজ জারুয়ারই দল। জারজ সন্তান না হইলে মুক্তিযুদ্ধ ভুলি যায় মানুষ। পারুল তো পারুল চায়া দ্যাখ, দ্যাশ জননীর গর্ভে কত জারুয়া আইজ দিনে দিনে বড় হয়।

(গ) সামরিক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির চিত্র :

'নেয়ামতকে নিয়ে গল্প নয়' গল্পে স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতির নানাদিক বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা, সামরিক শাসন এবং স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির অপতৎপরতার চিত্র ফুটে উঠেছে। এ গল্পে লেখক কাঁঠালবাড়ির সন্তান নেয়ামতের খ্যাতির বিস্তৃতি প্রসঙ্গে যে ভূগোল ব্যবহার করেছেন তা হলো ভেলাকোপা, হাগুরার হাট, বল্লার চর, মান্দারবাড়ি ও কাঁঠালবাড়ি। নেয়ামত এক ভবিষ্যৎদ্রষ্টা; সন্ধ্যা, মোতাহার, কুলসুম সম্পর্কে নেয়ামতের কথাই সত্য প্রমাণিত হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় নেয়ামত বলেছিল কাঁঠালবাড়িতে পাকিস্তানি মিলিটারি আসবে; তবে তারা বেশিদিন টিকতে পারবে না। তার কথাই সত্য হয়েছিল। নেয়ামত মোতাহারকে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, সে স্বপ্নে দেখেছে লাল ইটের দালানের সামনের বাগানে মোতাহার ফুল গাছে পানি দিচ্ছে। এই স্বপ্নের বাস্তব রূপ হচ্ছে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করে নেয়ামতকে জেল হাজত বাস করতে হয়। এ প্রসঙ্গে গল্পে উল্লেখ করা হয়েছে :

> সেই মোতাহার গ্রেপ্তার হয় জলেশ্বরী থেকে বনগ্রাম, মাত্র পাঁচ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করবার মাত্রেই, বহুদিন বিনা বিচারে সে বন্দি থাকে, তারপর তার কারাদণ্ড হয় সামরিক আইনের ধারায় সাত বৎসরের জন্য, জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকার তাকে কারাদণ্ড দিলেও সেই জিয়াউর রহমানই তাকে সংসদ নির্বাচনের আগে অনেক রাজবন্দির সঙ্গে মোতাহারকেও ছেড়ে দেন।

'নেয়ামতকে নিয়ে গল্প নয়' গল্পে পঁচাত্তর পরবর্তী রাজনৈতিক বাস্তবতার ছবি যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের অপতৎপরতার প্রসঙ্গও উল্লেখ রয়েছে। গল্পের মান্নান চরিত্রটি স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তির উত্থানের প্রতীক। এই নব্য রাজাকার গোষ্ঠীর সঙ্গে নেয়ামতের দ্বন্দ্ব বেঁধেছিল। দেশপ্রেমিক নেয়ামত একদিন স্বাধীনতা বিরোধীদের হাতেই প্রাণ হারায়। মূলত সামরিক শাসনামলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পুনরায় স্বাধীনতা বিরোধীদের দাপট বেড়ে যায়। এ প্রসঙ্গে গল্পকথককে বিমল বলেছিল:

> চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করে অচিরে বিমল আমার চোখে চোখ রাখে, মুহূর্তের জন্যে, তারপর রাস্তার দিকে চোখ ফিরিয়ে সে বলে, তুমি তো মান্নানদের চেন না, একাত্তরে ছোট ছিল বলে রাজাকার হয় নি, এবার আবার একাত্তর হলে মান্নানরাই হবে রাজাকার।

সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে স্বাধীনতার শত্রুদের উত্থান ঘটলে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি শঙ্কিত হয়ে পড়ে। সামরিক শাসকগোষ্ঠী মানুষের বাক স্বাধীনতা কেড়ে নেয়; সমাজে বিরাজ করে রুদ্ধাবস্থা। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> 'গল্পের একেবারে শেষ অংশে উন্মোচিত হয় নেয়ামতের শেকড় ও লুকায়িত বোধ-আশির দশকের রুদ্ধ সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় কুশলতার সঙ্গে চরিত্রের ভেতর - জগৎ উন্মোচিত করেছেন দক্ষ-কারিগরের মতো; আর একাধারে প্রকাশ করেছেন জীবন ও সমকাল সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।'[৭]

রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশ প্রাপ্তির পরপরই প্রত্যাশা পরিপন্থী ঘটনাবলি, কালিক পঙ্কিল রাজনীতির বিষয়টি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তাঁর ছোটগল্পে রাজনীতির উল্লেখ না থাকলেও রাজনীতিকে কেন্দ্র করে তিনি গল্প লিখেছেন। সেই গল্পে মানুষের সংগ্রাম ও সংগ্রামশীলতার পাশাপাশি জীবনযাপনের দ্বন্দ্বকেও বিপুলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত এসব গল্পে তাঁর রাজনীতি সচেতনতার পরিচয় মেলে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> সবকিছুর অন্তরালে যে অসুস্থ রাজনীতি, সৈয়দ হক সেই রাজনীতিটিকেও সনাক্ত করেছেন। তবু রাজনৈতিক লেখক বলতে যা বোঝায়, সৈয়দ শামসুল হক তা নন। তিনি রাজনীতিকে বুঝে নিতে চান ব্যক্তির ওপর রাজনীতির অভিঘাত এবং সেই ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া দেখার মাধ্যমে।[৮]

'জমিরউদ্দিনের মৃত্যু বিবরণ' গল্পে স্বাধীনতা পরবর্তী সামরিক শাসনে নিপতিত অন্ধকারাচ্ছন্ন বাংলাদেশের ছবি ফুটে উঠেছে। জমিরুদ্দিন বসুনিয়া একজন দানশীল পুণ্যবান ব্যক্তি; তিনি

পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ ও স্বাধীনচেতা। মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে পরিণত হন মুক্তির প্রতীকে। জমিরুদ্দিনের একটা শখের কথা শোনা যেত তা হলো, তিনি হাট থেকে কবুতর কিনতেন এবং সেগুলো খাঁচা থেকে বের করে মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দিতেন:

> নিজ হাতে একেকটা খাঁচা খুলে জমিরুদ্দিন কবুতরগুলো একে একে আকাশে উড়িয়ে দিতেন। রাত পর্যন্ত কাছারির মাঠে কাছারির বারান্দায় তাঁর মতো ধনী মানুষ দীনহীনের মতো বসে থাকতেন, শুধু এই জন্যে বসে থাকেন, কেউ যেন কবুতরগুলো আবার না ধরে, আবার না খাঁচায় পোষে, আবার না আহারের সেই কচি পাখিদের মাংসের প্রাণে জলেশ্বরীর রাত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

বয়োবৃদ্ধ জমিরুদ্দিনের মৃত্যুক্ষণ আসন্ন; এমন সময় তিনি পুত্রকে তার এক মহাপাপের কথা বলেছেন। সেই পাপের ক্ষমা না পেলে তিনি আল্লাহর সম্মুখে হাসরের মাঠে দাঁড়াতে পারবেন না। সকলের কাছে শ্রদ্ধাবান এই ব্যক্তির কী মহাপাপ আছে, তা নিয়ে এলাকাবাসী চিন্তিত হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে গল্পের শেষে দেখা যায়, মনসুর সাইকেলে চেপে এসে হঠাৎ খবর দেয়: 'সামরিক শাসন জারি হয়েছে। রেডিওতে খবর।' একদিকে সামরিক শাসনের খবর অপরদিকে জমিরুদ্দিনের মৃত্যু। 'আমরা চমকিত হয়ে জমিরুদ্দিন বসুনিয়া আর কখনো হাটে যাবে না কলা গাছের বাকলে তৈরি খাঁচা খুলে কবুতরগুলো আকাশে উড়িয়ে দিতে।' অবশেষে জমিরুদ্দিনের পুত্র, পিতার মহাপাপের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছে তা হলো মার্শাল ল জারি। কিন্তু এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? তাই আমিরুদ্দিন বাপের লাশের ওপর শিশুর মতো বিলাপ করে: 'মহাপাপ তো কয়া গেইলেন বাপো, কয়া যান মহাপাপের উদ্ধার কিসে? বাপো তোমার কয়া যান গো, কয়া যান।'

জলেশ্বরীর জমিরুদ্দিনের মৃত্যু গল্পকে ভিন্নমাত্রিক ব্যঞ্জনায় দাঁড় করিয়েছে; মুক্তির প্রতীক জমিরুদ্দিনের মৃত্যু প্রতীকী পরিচর্যায় মূলত সমগ্র বাংলাদেশের সামরিক শাসনের বন্দিদশার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> 'জমির উদ্দিনের মৃত্যু বিবরণ' গল্পে জলেশ্বরীর জীবন প্রবাহের অনুষঙ্গে সামরিক শাসনে পিষ্ট বাংলাদেশের সামগ্রিক বন্দিত্বের যন্ত্রণা প্রতীকায়িত হয়েছে। সামরিক শাসন জারি হবার কিছুক্ষণের মধ্যে প্রয়াত হন জলেশ্বরীর জমিরুদ্দিন। সামরিক শাসনের রুদ্ধ পরিবেশে, শৃঙ্খলিত ভূখণ্ডে জমিরউদ্দিনের মতো ব্যক্তিত্ববান পুরুষ জীবনধারণে প্রস্তুত নয় কারণ জীবিতাবস্থায় তিনি নিজ হাতে বন্দি কবুতরকে খাঁচামুক্ত করে দিতেন। স্বাধীন ভূখণ্ডে সমরতন্ত্র মানুষের জন্য এক মহাপাপ; এই মহাপাপের কথাই বলেছেন জমিরুদ্দিন।'[৯]

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক দলগুলোর ভণ্ড রাজনীতিক, সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকামী মানুষের প্রচণ্ড ঘৃণার প্রকাশ ঘটেছে আলোচ্য গল্পে। দেশের রাজনৈতিক অব্যবস্থা, বিশেষত স্বাধীনতা পরবর্তী কালে মুক্তিযোদ্ধাদের আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু, সামাজিক অস্থিরতা, নৈরাজ্য, স্বৈরাচার, অপশাসন, জনসাধারণের মনে যে হতাশা সৃষ্টি করে সে বিষয়গুলোও ভিন্ন ভিন্নভাবে তাঁর গল্পে রূপায়িত হয়েছে। গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতায় সমকালীনসম্পৃক্ততা যুক্ত হওয়ায় তাঁর গল্প পেয়েছে বিশেষ মাত্রা। সমাজকে নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করে তুলে আনা, কিংবা পর্যবেক্ষণশীল দৃষ্টিতে তা ফুটিয়ে তোলা লেখকের নৈতিক দায়িত্ব মনে করেন গল্পকার হাসান আজিজুল হক। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য স্মরণীয়:

> কথা সাহিত্যিকের কাজ তাই জাদুর কাঠি বুলিয়ে বাস্তবকে ভুলিয়ে দেওয়া হতে পারে না বরং তাঁর পালন করা উচিত শল্যচিকিৎসকের নিষ্ঠুর ভূমিকা। সমকালীন জীবনের বাস্তবতার ছবি আঁকাই নয় শুধু, এমন কি সামগ্রিক ছবি দেওয়াও নয়, তাঁর কাজ সমকালীন জীবনকে আমূল কেটে কেটে বিশ্লেষণ করে দেখানো, সবকটি স্তর, সবরকম আঁশ, তাঁর গভীরতম স্বরূপ, জীবনে সমস্ত তন্তু আলাদা করে ফেলা এবং একেবারে চোখের সামনে আনা।[১০]

'সোনার মা বর্গুন বিবি' গল্পে নব্বই এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে শহিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সোনা ওরফে দলিলর রহমানের আত্মত্যাগের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। সমকালীন দেশের রাজনীতি ও ছাত্র সমাজের ভূমিকার বিষয়টি গল্পের প্রেক্ষাপট রয়েছে। জলেশ্বরীর মেধাবী সন্তান সোনা বর্গুন বিবির বাঁচার অবলম্বন ছিল। গ্রামের বিধবা মাতা সন্তানের পড়াশুনার খরচ যোগাতে অন্যের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করত। তার প্রথম মৃত্যু বার্ষিকীতে জলেশ্বরী কলেজ মাঠে স্থানীয় তরুণ সমাজ সীমিত কর্মসূচির আয়োজন করে। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে জীবন উৎসর্গকারী ছাত্রের মৃত্যুদিবসে নেই কোন আয়োজন। নিষেধাজ্ঞা ও গোয়ান্দা নজরদারি সত্ত্বেও স্থানীয় ছাত্রনেতারা তা উপেক্ষা করে স্মরণ সভার আয়োজন করে। তবে তার মৃত্যু বার্ষিকীতে ঢাকা থেকে কোন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মী জলেশ্বরীতে আসেনি। জলেশ্বরীর গণতন্ত্রকামী সাহসী নেতাকর্মীরা দলিলের বাড়িতে গিয়ে তার নির্বাক ক্রন্দনরত জননীকে সান্ত্বনা দেয় এবং তৈরি করে প্রতিবাদী ব্যানার : 'শহীদ দলিলর রহমানের রক্ত বৃথা যেতে দেব না।' এলাকার ছাত্রনেতা মনসুর স্মরণ সভায় দলিলরের জননীর কাছে অঙ্গীকার করে স্বৈরাচার উৎখাতের:

> শহীদ দলিলর রহমানের গর্বিত জননী বর্গুন বিবির চরণ স্পর্শ করে আজ আমরা শপথ গ্রহণ করছি আজ আমরা বাংলার লাখো লাখো তরুণ, বীর প্রসবিনী মা বর্গুন বিবির কাছে অঙ্গীকার করছি, মাগো, এই দেশ থেকে তোমার সন্তানেরা, তোমার লাখো লাখো দলিলর রহমানেরা উৎপাটিত করবে শোষণ আর স্বৈরাচার।

এভাবেই গল্পে গণতন্ত্রের জন্য এদেশের সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ ও আত্মত্যাগের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। 'সোনার মা বর্গুন বিবি' গল্পের প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> 'সোনার মা বর্গুন বিবি' গল্পে স্বৈরাচারের বুলেটে নিহত জলেশ্বরীর দলিলর রহমান তথা সোনার আত্মত্যাগের কাহিনী বর্ণিত হলেও লেখকের মূল লক্ষ্য সুবিধাবাদী লোকরঞ্জন রাজনীতির অন্তঃসারমশূন্যতা, ভন্ডামি ও কপটতা চিহ্নিত করা। জলেশ্বরীর সোনার বস্তুত সামরিক স্বৈরাচার-বিরোধ আন্দোলনে আত্মাহুতি দেয়া এদেশের অসংখ্য শহীদের প্রতিনিধি।[১১]

(ঘ) বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় অভাব-দারিদ্র্যের চিত্র :

১৯৭১ সালে এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর নতুন রাষ্ট্রে তাদের সেই কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসেনি। শোষণহীন, বৈষম্যহীন, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি বাংলাদেশ এদেশের মানুষ প্রত্যাশা করেছিল, কিন্তু সেই অর্থনৈতিক মুক্তি সুদূর পরাহতই থেকে যায়। লেখক উত্তরাঞ্চলের হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভাবের তীব্রতা নিয়ে লিখেছেন 'পূর্ণিমায় বেচাকেনা' নামক গল্পটি। আলোচ্য গল্পে স্ত্রীকে বিক্রির মধ্য দিয়ে রংপুর অঞ্চলের দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর বাঁচার লড়াই তুলে ধরেছেন। গল্পের কথক একজন ঔষধ বিক্রেতা, তার কাছে ভুখা লোকটি সংসারের প্রয়োজনীয় ছোট-খাট জিনিস প্রতি নিয়ত বিক্রি করে। গল্পের কথকের জীবিকার অবলম্বনও বিশেষ জোরালো নয়। সেও এক প্রকার চৌর্যবৃত্তি করে বেঁচে আছে। ঔষধ বিক্রেতার দোকানে আসা অভাবগ্রস্ত লোকটি নিয়মিত যাতায়াত করে এবং তাদের দুজনের মধ্যে ব্যক্তিগত নানা সুখ-দুঃখের আলাপ-চারিতায় একে অপরের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ঔষধ বিক্রেতা একদিন খিচুড়ি রান্নার আয়োজন করলে লোকটি উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই বিষাদময় একটি স্মৃতি তার মনে পড়ে যায়। তার জন্মদাত্রী সন্তানের মুখে অন্ন দিতে ব্যর্থ হয়ে আত্মহননের পথ নেয়। ঔষধ বিক্রেতা বিভিন্ন সময়ে লোকটির অনুরোধ রক্ষার্থে শেষ সম্বলটুকু দিয়ে তার দ্রব্যাদি ক্রয় করে থাকে। কিন্তু এক পর্যায়ে ঔষধ বিক্রেতার উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়। এমন দুর্দিনে এক পূর্ণিমার রাতে ভুখা লোকটি এসে হাজির হয় এবং দশটি টাকা চায়। কিন্তু এবার কোন পণ্য-দ্রব্য নয় অভাবের তাড়নায় নিজের স্ত্রীকে ঔষুধ বিক্রেতার কাছে বিক্রির জন্য নিয়ে আসে:

> হবে না, স্যার? দশটা টাকা হবে না? কোথাও এত সস্তায় পাবেন না, স্যার। প্রথমেই আপনার কথা মনে হলো, আপনার কাছেই নিয়ে এলাম। মাত্র দশ টাকা।

মূলত গল্পের ঘটনাবলি বিশ্বাসযোগ্য না হলেও এর মধ্য দিয়ে লেখক উত্তরবঙ্গের মঙ্গাপীড়িত অঞ্চলের মানুষের অন্তরের কান্না ফুটিয়ে তুলেছেন।

সৈয়দ শামসুল হক রচিত 'মনোহরকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে' গল্পে ভাসমান দিনমজুর মনোহরের অভাব-দারিদ্র্যে পূর্ণ পরিবারের জীবনকাহিনি বর্ণিত হয়েছে। দরিদ্র এই মনোহর সপরিবার নিখোঁজ। মহাজন মণ্ডলদের বাড়িতে দিনমজুরি করা মনোহরের খোঁজ পড়ে তাদের নতুন দা-খানা খুঁজে না পাওয়ায়। শেষ পর্যন্ত তারা মনোহরের ঝুঁপড়িতে আগুন দেয়; কেননা তাদের মনে হয় হারানো ঐ দা বিক্রি করে মনোহর ইলিশ কিনেছিল। চারদিনের কামলার টাকা নিয়ে যখন সে বাজারে যায় তখন তার মনে বাসনা জাগে সন্তানদের ইলিশ মাছ খাওয়াবে। কিন্তু শুধু ইলিশে কি ক্ষুধা মিটবে? মনোহর চাল ক্রয় না করে শুধু ইলিশ এনেছে বলে তার স্ত্রী ক্রোধে মাছটি ছুঁড়ে মারে মনোহরকে লক্ষ করে এবং মূর্ছিত হয়ে পড়ে। অভুক্ত সন্তানেরা ঘুমিয়ে পড়েছে; আর দিশাহীন মনোহর স্তব্ধ হয়ে যায় বজ্রাহতের মতো। এরপর সিদ্ধান্ত নেয় বাঁচতে হলে তাকে আবার সেই মেঘনার পাড়ে যেতে হবে; মধ্যরাতে তারা বাঁচার আশায় বেরিয়ে পড়ে :

> মানুষের জীবনের বিস্ময়, তার অস্তিত্বের বিস্ময়, এর সব কিছু সম্পর্কেই মানুষের অজ্ঞতা বিস্ময়কর। অতএব কে বিশ্বাস করবে, মাঝরাতে সমস্ত কিছু নড়ে ওঠে; গাছ, বাড়ি, মাঠ, নদী, মানুষ। মনোহরের স্ত্রী উঠে বসে, মনোহর তাকে উঠে বসতে সাহায্য করে। মনোহর তার সন্তানদের জাগায়, মনোহর সবাইকে নিয়ে গোল হয়ে বসে বলে, যদি না খেয়েই মরতে হয় তাহলে চল, সেই মেঘনাতেই যাই।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের বিরাজমান ধনী-দরিদ্র্যের শ্রেণিবৈষম্যের পটভূমিকায় সৈয়দ শামসুল হক রচনা করেন 'সাহেব চান্দের ঈদ-ভোজন'। নিঃস্ব সাহেব চান্দ মোক্তার সাহেবের বাড়ির গৃহকর্মে নিযুক্ত। সে ঈদের দিনে মোক্তারবাড়িতে সকলে যখন পোলাও ও মাংসের মত উন্নত খাবারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন সকলের সম্মুখে উনুন জ্বালিয়ে বেগুনভর্তা দিয়ে অন্ন গ্রহণ করে। তার এই রান্নার আয়োজন দেখে শুধু বৃদ্ধ জসিমদ্দি জিজ্ঞেস করে, 'বাহে, সাহেবচান্দ, কয়া যান বাহে, ঈদের দিনে ক্যানে এই ভোজন তোমরা কইরলেন? এই বাগুন দিয়া ভাত?' সাহেব চান্দের এই প্রতিবাদী আয়োজনের কারণ হতে পারে হয়তো কেউ আশ্রিত সাহেব চান্দকে পরিহাস করেছিল, কিংবা কমিউনিস্ট বেঁকা মিয়ার প্রেরণায় সে এ কাজ করেছিল:

> বেঁকামিয়ার সঙ্গে তোমার দেখা, অনেকক্ষণ তোমরা কথা বলছিলে, বেঁকামিয়া সে কমিউনিস্ট কে না জানে, সে কি তোমাকে এমন কিছু বলেছিল যার জন্যে এই প্রথম তুমি দেখতে পাও মানুষের সঙ্গে মানুষের কি ভয়াবহ দূরত্ব?

কমিউনিস্ট বেঁকামিয়ার সংস্পর্শে সাহেব চান্দের মধ্যে আকস্মিক পরিবর্তন হয়। একটি প্রতিবাদী চেতনা যেন জাগ্রত হয় ঘৃণে ধরা সমাজের বিরুদ্ধে। লেখক ধনিক গোষ্ঠীর ঈদ উদযাপনের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ করেছেন। 'জন্মদাসত্বের গভীর যন্ত্রণা থেকেই সাহেব চান্দ উপলব্ধি করে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যকে।'[১২] স্বাধীনদেশে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন আসেনি। ব্রিটিশ শাসনামল, পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশ; কোন সময়ই খেটে খাওয়া মানুষের দুর্দশা থেকে মুক্তি ঘটেনি। আঠারো বছরেও সাহেব চান্দের জীবনে পরিবর্তন আসেনি; গোলামি থেকে মুক্তি মেলেনি। 'সাহেব চান্দের ঈদ-ভোজন' গল্পে মোক্তার বাড়ির আবাল্য দাস সাহেব চান্দ কর্তৃক ধনী-দরিদ্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবধান উপলব্ধির মধ্য দিয়ে লেখকের রাজনৈতিক শ্রেণী সচেতনার প্রকাশ ঘটেছে।'[১৩]

স্বাধীন দেশে বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের দারিদ্র্য এবং এ ব্যবস্থার নিরসনকল্পে জনগণের ঐক্য লেখক অনুভব করেছেন। লেখক 'শরবতির পাশ ফেরা' গল্পে নিম্নবর্গের এক ভবঘরে নারী শরবতিকে ঘিরে গল্পের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। ছিন্নমূল এই নারীকে জলেশ্বরীর পথে-ঘাটে সব সময় দেখা যায়। একদিন হতদরিদ্র এই যুবতী জোহরের নামাজের সময় হযরত শাহ সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের মাজারের সিঁড়িতে বস্ত্রহীন অবস্থায় শায়িত থাকে। তাকে এঅবস্থায় দেখে এলাকার মুসল্লিরা নির্বাক হয়ে যায়। অথচ জনসমাগমের এই পবিত্র স্থান মাজারের সিঁড়িতে শরবতিকে দেখা যায় দ্বিধা সংকোচহীন, অনেকটা ভাবলেশমুক্ত এবং নির্ভয়া :

> সে নিদ্রিত কিম্বা নিদ্রিত নয়, বোঝা যায় না; তার চোখ মুদিত ঠোঁটে পাতলা হাসি, হাসিটুকু যেভাবে খেলা করছে তাতে মনে হয় শরবতি জেগে আছে, কিন্তু তার দেহ নিস্পন্দ, হাত পা এমন শিথিল যেন বা সে গভীর ঘুমে বহুক্ষণ আগেই গলে গিয়েছে।

ভবঘুরে নারীকে আকস্মিকভাবে মাজারপ্রাঙ্গণে বস্ত্রহীন অবস্থায় দেখে অনেকে বিব্রত হয়, অনেকে রাগান্বিত হয়। জোহরের নামাজ শেষ করে সিঁড়িতে নগ্ন যুবতীর শুয়ে থাকার দৃশ্য দেখে জলেশ্বরী বাসীর মনোজগতে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আলোড়ন-বিলোড়ন ঘটে। 'জলেশ্বরীর হযরত শাহ সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের মাজারে শায়িত নগ্ন শরবতিকে কেন্দ্র করে জলেশ্বরীর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যে চাঞ্চল্য, আলোড়ন সৃষ্টি হয় তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই 'শরবতির পাশ ফেরা' গল্পের প্রতিপাদ্য।'[১৪] গল্পটি গ্রামের ছিন্নমূল, দুর্দশাগ্রস্ত ও ক্ষুধার্ত মানুষের দিন যাপনের নির্মম আলেখ্য। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কাঠামো, নারীর অসহায়ত্ব, পুরুষতান্ত্রিকতা গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে জায়গা করে নেয়। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবিত্ত, দরিদ্র জনগণের পক্ষে লেখকের অবস্থানের কারণেই এসব মানুষ তাঁর গল্পে সহানুভূতির সঙ্গে স্থান দখল করেছে।

(ঙ) ধর্মাশ্রয়ী গল্পে জীবনবাস্তবতা :

সৈয়দ শামসুল হক রচিত 'যারা বেঁচে আছে' গল্পে সাকিন আলী ও তার মৃত স্ত্রী আম্বিয়াকে ঘিরে গ্রামীণ জীবনে ধর্ম ও সমাজের দ্বন্দ্বের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। এই গল্পে একইসঙ্গে ধর্মের অপব্যাখ্যার দিকও তুলে ধরা হয়েছে। দিনমজুর সাকিন আলীর স্ত্রী আম্বিয়ার মৃতদেহ ধরলা নদীর ভাঙনে বেরিয়ে পড়লে এলাকাবাসীর মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এক মাস আগে মারা যাওয়া আম্বিয়ার লাশ কবরে অবিকৃত দেখতে পেয়ে গ্রামবাসীর মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মসজিদের বয়োবৃদ্ধ মাওলানা সাহেব ভীত গ্রামবাসীর সামনে মৃত আম্বিয়াকে নিয়ে ধর্মের ব্যাখ্যা দেয়। অল্পজ্ঞ মাওলানা পাপীদের শ্রেণি বিভাগ করে আম্বিয়াকে তিন নম্বর পাপী হিসেবে বর্ণনা করে:

> আর তৃতীয় প্রকার পাপী মাওলানা সাহেব আবার নাটকীয়ভাবে থামেন। ভাইসব, সে লাশ যেমনকার তেমন থাকে, পচে না, গলে না, পোকা ধরে না, কেয়ামততক এক রকম থাকে। কেন থাকে? তারা এত পাপী যে, গোর পর্যন্ত আল্লার কাছে কেঁদে কেঁদে বলে, ইয়া আল্লাহ, এত বড় গুনাহগার তুমি আমাকে দিলে? আল্লার ফেরেশতা পর্যন্ত চাবুক তুলেও পাথর হয়ে থাকে। তখন আল্লাহ এদের হৃদপিন্ডের ভেতরে দোজখের আগুন জ্বালিয়ে দেন। আপনারা লক্ষ করে যদি দেখেন, তবে দেখবেন, ঐ লাশের ঠোঁটে কালো কালো সূক্ষ দাগ আছে, সে দাগ দোজখের আগুনে হৃদপিন্ড পুড়ে যাবার নিশানা।

গ্রামের অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ মাওলানার ধর্মীয় বক্তব্যে প্রবলভাবে আচ্ছন্ন হয়। ধর্মাশ্রয়ীরা তাকে মহাপাপী হিসেবে চিহ্নিত করে। স্ত্রী আম্বিয়ার লাশ বেরিয়ে পড়লে স্ত্রীর মুখখানা একবার দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, কিন্তু অনুমতি মেলে না। উপরন্তু মওলানা সাহেব স্ত্রীর এহেন অবস্থার জন্য তাকেই গালমন্দ করে : 'এই জানোয়ারদের জন্যেই গ্রামের পুণ্যবানদের নাজাত নাই।' গ্রামীণ সমাজে উগ্র ধর্মীয় শক্তির প্রতিনিধি চরিত্র মাওলানা। এ সব ধর্মবেত্তা ব্যক্তিবর্গ নিজেদের স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করে থাকে :

'মাওলানা চরিত্রের মধ্য দিয়ে এদেশে গ্রামীণ সমাজের ফতোয়াপ্রবণ উগ্র ধর্মীয় শক্তির চেহারা অঙ্কিত হয়েছে।'[১৫] হত দরিদ্র সাকিন আলী অর্থের অভাবে স্ত্রীকে কবর দিয়েছিল নদীর ভাঙাকূলে। গোরস্থানের চাঁদা চেয়েছিল হাজী সাহেব; তা দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে সেখানে করব দিতে পারেনি। মাওলানাকে টাকা দিতে পারবে না বলে জানাজার জন্য তাকে ডাকা হয়নি। উক্ত পরিস্থিতিতে অবশেষে মওলানা সিদ্ধান্ত দিয়েছে লাশের পুনরায় জানাজা হবে। এবার গ্রামের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ হাজি সাহেব, দেওয়ানী, মওলানা সাহেবসহ অসংখ্য লোক জানাজায় অংশগ্রহণ করে। অবশেষে ধনীদের কবরস্থানে আম্বিয়ার দাফন হয়। এবার সাকিন আলী অন্তরে স্বস্তি ও শান্তি অনুভব করে:

> সাকিন আলী একা দাঁড়িয়ে থাকে কবরের কাছে। গাছপালাকে আবার গাছপালা মনে হয় তার, জীবনকে জীবন। কবরের ওপর, মাটির ওপর হাত বোলায় সে। যেন আম্বিয়াকে আবার সে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে।

সৈয়দ শামসুল হক লোকজ জীবনে দ্বন্দ্ব সংঘাতের সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিক চরিত্রকে সেখানে মূল চালকের আসনে বসিয়েছেন। গ্রামীণ সমাজে মাজারের খাদেম কিংবা মসজিদের ইমামের প্রভাব ব্যাপক। তাদের দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে সমাজ পরিচালিত হয় এবং এলাকার মানুষ তাদের সমীহ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> গ্রামীণ জীবন সৈয়দ শামসুল হকের গল্পের অন্যতম বিষয়। তাঁর অসংখ্য গল্পে গ্রামীণ মানুষের জীবন ফুটে উঠেছে। বৃটিশ আমলের বাংলার আঞ্চলিক গ্রামীণ জীবন থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের প্রতিচ্ছাপ পাওয়া যায় তাঁর গল্পে। অভাব, দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মান্ধতা, লোকজ জীবন ইত্যাদি তাঁর গল্পে এসেছে চরিত্রের মাধ্যমে।[১৬]

সৈয়দ শামসুল হক রচিত 'আরো একজন' গল্পে গ্রামীণ জীবনে মাজারের খাদেমের প্রভাব ও ফতোয়ার দ্বারা জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণে বিষয়টি খুব গুরুত্বের সঙ্গে গল্পে স্থান পেয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদদের স্মরণে শহিদ মিনারে সর্বস্তরের জনগণ পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে থাকে। জলেশ্বরীর হযরত শাহ সৈয়দ কুতুব উদ্দিনের মাজারের খাদেম সৈয়দ আবদুস সুলতান ফতোয়া দিয়েছে যে, শহিদ মিনারে ফুল দেয়া হিন্দুদের মতো পূজা করার সামিল। যারা এটা করবে তারা শুধু দোজখবাসীই নয়, পরকালে তাদের সত্তর হাজার সাপ দংশন করবে। এ সকল পাপী বান্দাদের পিপাসার সময় নাছারাদের বিষাক্ত ঘায়ের পুঁজ পান করতে দেয়া হবে। খাদেমের এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে আলু-পটলের দোকানী অশিক্ষিত কসিমুদ্দি। সে উচ্চ কণ্ঠে বলেছে, মাজারে এসে মানুষ সেজদা করে, মানতের পয়সা দেয়, সেটা যদি পাপ না হয়, পূজা না হয়, তাহলে শহিদ মিনারে ফুল দিলে তা পূজা তবে কেন? যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য দেওয়ায় খাদেম কসিমুদ্দিকে কাফের আখ্যা দেয়। এরপর কসিমুদ্দি দৃঢ়ভাবে খাদেমকে জানিয়ে দেয়, যত পাপই হোক সে ঢাকার শহিদ মিনারে ফুল দিতে যাবে। ধর্ম ব্যবসায়ী ফতোয়াবাজ খাদেমের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ কসিমুদ্দি একাই লড়ে যায়। লেখক তার অনমনীয় মনোভাব আঞ্চলিক ভাষায় তুলে ধরেছেন :

> এইবার মুঁই ঢাকা যামো, আর একুশে ফেব্রুয়ারি দেখিমো, শহিদ মিনারে গিয়া ফুল দেমো, পত্রিকায় মুঁই দেখিছো ফুলে ফুলে ভরি গেইছে শহীদ মিনার, য্যান বেহেশতের একখান টুকরা হয়া আছে গো। মুঁই সেই শহীদ মিনারে যায়া হামার দ্যাশের যাবত শহীদের নামে সেলাম করিমো, তা হামাক দোজখে সইত্তর হাজার সর্পে দংশায় হামার কোন দুষ্কর নাই, বাহে।

কসিমুদ্দি মাজারপ্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে খাদেম তাকে অভিশাপ দেয়। কসিমুদ্দি তার পুত্র জসিমদ্দিনকে সঙ্গী করে ঢাকা শহিদ মিনারে ফুল দিতে আসে। শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য শেষে যাদুঘর দর্শনে গিয়ে তার বংশের শেষ স্মৃতি চিহ্ন রূপার প্রাচীন মুদ্রা দেখতে পায় এবং চিৎকার করে মুদ্রাটি নিজের দাবি করে। এ সময় দারোয়ান তাকে বের করে দিলে ক্রুদ্ধ কসিমুদ্দি ব্যস্ত রাস্তায় মিনিবাসের চাপায় মারা যায়। তার মৃত্যুর খবরে খাদেম এবার নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করে অপপ্রচারে লিপ্ত

হয়। এভাবেই খাদেম দ্বিগুণ উৎসাহে গ্রামের মানুষকে ধর্মের ভয় দেখিয়ে কূপমণ্ডুকতার মধ্যে আবদ্ধ রাখার প্রয়াস চালায়। স্বাধীনদেশে মৌলবাদীগোষ্ঠীর পাকিস্তানবাদী মানসিকতা ও ধর্মান্ধতার প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> লেখক একদিকে ধর্মের লেবাসধারী ভণ্ড ফতোয়াবাজদের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন, অন্যদিকে একজন সাধারণ আলু-পটোলের দোকানি যে হতে পারে এদেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি, তার মাধ্যমে একটি প্রতিবাদ গড়ে তুলেছেন ভণ্ডদের বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে তিনি কসিমদ্দির মাধ্যমে এদেশের সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনা, তার জাতীয়তাবোধ সাংস্কৃতিক চেতনাকে সূক্ষ্মভাবে চিত্রায়িত করেছেন।[১৭]

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় বহুকাল পূর্ব থেকেই রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার হয়ে আসছে। সমাজজীবনের বেশ কিছু উপাদান রয়েছে যেগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গ্রামীণ রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে তা হলো ধর্মান্ধতা। এলাকার লোক রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়াসহ নানা কূটকৌশলে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে থাকে। এমন একটি বিষয়বস্তুকে উপজীব্য করে সৈয়দ শামসুল হক রচনা করেন 'কোথায় ঘুমাবে করিমন বেওয়া' নামের একটি গল্প। মাওলার সাহায্যে করিমনের চরিত্রে ভ্রষ্টার কলঙ্ক এঁকে দেওয়া হয়। গ্রামীণ চরাঞ্চলের এক সাহসী দরিদ্র নারী করিমন বেওয়াকে ঘিরে গল্পের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। করিমনের আকস্মিক মৃত্যুর পর নিজ গ্রাম বল্লার চরে তার শেষ ঠিকানা হয়নি; শেষ পর্যন্ত করিমনের পোষ্যপুত্র এবং তার এক সহোদর করিমনকে জলেশ্বরীতে এনে হযরত শাহ সৈয়দ কুতুউদ্দিনের মাজারের সিঁড়িতে নামিয়ে রেখে চলে যায়। প্রান্তিক এই নারী তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতিহিংসার শিকার হয়। নির্বাচনের সময় করিমন বেওয়া সরকারি দলের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। ফলে নির্বাচনে জয়ী সরকারি দলের লোকেরা তার মৃত্যুর পর তার ওপর প্রতিশোধ নেয়। তারা অপপ্রচার চালায় যে, করিমন জারজ সন্তানের জননী। জানাজার জন্য মাওলানা সাহেবের কাছে এলাকার মানুষ মিনতি জানালে তখন তিনি ক্ষমতাসীনদের ভয়ে জানাজা পড়াতে অপরাগতা জানান : 'বাবা সকল, 'আঁরে আফনেরা মাফ করিয়েন; তারপর থেকে তিনিও উধাও।' স্বজনেরা নিরুপায় হয়ে জলেশ্বরীর মাজার প্রাঙ্গণে তার লাশ ফেলে যায়। লাশের গন্ধে সকলে অস্থির হয়ে ওঠে:

> জলেশ্বরীর সর্বত্র করিমন বেওয়ার লাশের গন্ধ কেবলি পাওয়া যায়। বৃষ্টির অপেক্ষায় জলেশ্বরীর মাটি স্বস্তিহীন, আকাশ মেঘহীন, বাতাস গতিহীন, মানুষ ঘুমোতে চায়, ঘুম আসে না। . . . আমরা বিকটভাবে আবিষ্কার করি, করিমন বেওয়া আমাদেরই পাশে ঘুমিয়ে আছে, কারণ সে আর কোথায় ঘুমোবে?

মূলত ১৯৭১ সালে এদেশের মানুষ দেশ স্বাধীন করেছিল তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য। অপরদিকে ধর্মান্ধতা থেকেও তারা মুক্ত হতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে আশানুরূপ কোনো ইতিবাচক রূপান্তর ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> কারচুপির মাধ্যমে নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী কর্তৃক বিরুদ্ধ পক্ষাবলম্বী করিমন বেওয়ার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ এবং করিমনের অকাল মৃত্যুর পর জনৈক মাওলানা দ্বারা মিথ্যে অভিযোগ ও ফতোয়াদানের ঘটনা এদেশের গ্রামীণ রাজনীতির আভ্যন্তর কদর্যতা ও নোংরামির পরিচায়ক।[১৮]

সৈয়দ শামসুল হকের 'জীবিতের ভয়' একটি ধর্মাশ্রয়ী গল্প। লেখক গ্রামের মাজার ও তার আশেপাশে ভিক্ষাবৃত্তিতে রত নর-নারীকে ঘিরে গল্পের কাহিনি বুনেছেন। জলেশ্বরীর হজরত শাহ সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের মাজারের খাদেম সাজ্জাদানশিন সৈয়দ আবদুস সুলতান মাজার প্রাঙ্গণে ফজরের নামাজ শেষে জটলা দেখে মুয়াজ্জিনের কাছ থেকে জানতে পারেন যে, একজন ভিক্ষুকের মৃত্যু হয়েছে। মাজার প্রাঙ্গণে লাশ নিয়ে আগত পুষ্প ভিখারিনীকে ঘিরে ইমাম ও মুয়াজ্জিনের কল্পনায় তাদের নারী লোলুপ মানসিকতা ফুটে উঠেছে। এ গল্পের শেষে লেখক ধর্মজীবী ইমাম ও মুয়াজ্জিনের ভণ্ড রূপ উন্মোচন করেছেন। মুখোশধারী এসব ধর্মবেত্তা ব্যক্তির অন্তর্জগতের কলুষতা তুলে এনেছেন। ধর্মের নামে মানুষ

ঠকানো এক সময়ে আমাদের সমাজে বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। ধর্মের অন্তরালে নিজের আসল চরিত্র লুকিয়ে রেখে সামাজিক অনাচার চালিয়ে যায় মুয়াজ্জিন :

> মোয়াজ্জিনের মুখ থেকে হাসিটি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়ে যায়- মৃত্যুভয়ে নয়- জেনার জন্যে বিচার যখন হাশরের মাঠে হবে, সেই কথা ভেবে সে এই ভোরবেলাতেও মাথায় আধহাত ওপরে সূর্যের তাপ অনুভব করে ঘেমে ওঠে; আবার একপাশে একথাটি ভেবেও চোরাশান্তি হয় যে, তার মৃত্যু এখনো অনেক দূরে, সময়কালে তওবা করা যাবে।

(চ) নারীর প্রতি সহিংসতা :

সৈয়দ শামসুল হক রচিত 'যেনবা এক মহামারী থেকে' গল্পে গ্রামাঞ্চলের নারী নির্যাতনের ঘটনা মুখ্য বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। বুড়ির চরের বাসিন্দা কৃষক সদর আলি বসুনিয়ার দশম শ্রেণি পড়ুয়া রূপসী কন্যা আমেনাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। তার লাশ পাটক্ষেতে পাওয়া যায়। এ ঘটনায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কাউকে আটক করতে পারেনি। পুলিশের অপরাধ দমনে ব্যর্থতায় গ্রামবাসীরা ভীত ও স্তব্দ হয়ে পড়ে। আমেনার খুনিদের গ্রামবাসীরা অনুমান করার চেষ্টা করে; জলেশ্বরী, মান্দারবাড়ি, বুড়িরচর এসব এলাকার কেউ তাকে প্রণয়ের ফাঁদে ফেলে ধর্ষণ ও পরে হত্যা করে থাকতে পারে। এ ধরনের ঘটনা এলাকায় নতুন নয়; তার পূর্বে সংখ্যালঘু বিপিনের কন্যার ভাগ্যেও ঘটে একই নির্মম পরিণতি। বিপিনের কন্যাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়; তার লাশ শেয়াল কুকুরে খেয়েছে বাঁশবনের ভেতর: 'বছর চারেক আগে বিপিনের মেয়েকে একরাতে কারা উঠিয়ে নিয়ে যায়; লাশ পাওয়া যায় বহু দূরে মান্দারবাড়ির রাস্তায় এক বাঁশবনের ভেতরে।' গল্পে সন্তান হারা দুই পিতার অসহায়ত্ব ও বুকফাটা আর্তনাদ সমকালে আইন প্রয়োগে শিথিলতার দিকটি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত।

জলেশ্বরীর গল্পগুলো গ্রামের সাধারণ মানুষকে নিয়ে লিখেছেন। তাদের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের নানা অসঙ্গতি, অনুষঙ্গ-প্রসঙ্গ উপস্থাপনে লেখক প্রবন্ধের আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন। জলেশ্বরীর গল্পের কাঠামোতে প্রথাগত চরিত্র নির্মাণ কৌশল অনুসৃত হয়নি অর্থাৎ একক কোনো কেন্দ্রীয় চরিত্রকে ঘিরে কাহিনি আবর্তিত হয়নি। এছাড়া এ পর্যায়ের গল্পসমূহ বিবরণধর্মী ; আমরা নামক সামূহিক জনগোষ্ঠীর স্মৃতিচারণে, কথকতায়, বর্ণনায় কাহিনি বিধৃত হয়েছে। গল্পে প্রায়শ কেন্দ্রীয় কোন চরিত্র না থাকায় এখানে প্রান্তিক চরিত্রগুলোই ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। জলেশ্বরীর জীবনভাষ্য উপস্থাপনে লেখকের স্বাতন্ত্র্য প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> একপর্যায়ে গল্পে নিছক আখ্যান নির্মাণ আর তাঁর যথেষ্ট মনে হতে থাকে না; তিনি ছোটগল্পেকে বলতে শুরু করেন 'গল্প-প্রবন্ধ', আর সৈয়দ হকের গল্প বলার ভঙ্গি- বর্ণনায় 'আমি'র বদলে বহুবাচক 'আমরা', নিজস্ব এক ভৌগোলিক গ্রাম জলেশ্বরী, জন্মগ্রাম কুড়িগ্রামের মৃত্তিকা ও মানুষ যার অভ্যন্তরে-তার মানুষ, আচার, ভাষা-প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো তিনি উপস্থাপন করেন তাঁর গল্পের পর গল্প, উপন্যাস তো বটেই।[১৯]

উত্তর বাংলার পরিবেশ, রোদছায়া, গাছপালা, মানুষের সারল্য আর সংগ্রামকে প্রেক্ষাপট করে সৈয়দ শামসুল হক তাঁর জলেশ্বরীর কথা ভুবন বিস্তৃত করেছেন। যে উত্তর বাংলার আরেক নাম মঙ্গা, সে উত্তর বাংলার জনপদ জলেশ্বরী নামে লেখকের মনোগহনে ঠাঁই পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে বলা যায়, দেবেশ রায়ের যেমন তিস্তা, কিংবা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের যেমন মালগুড়ি, তেমনি সৈয়দ শামসুল হকের জলেশ্বরী। জলেশ্বরীর গল্পগুলোর নেপথ্যে রয়েছে দুর্ভিক্ষ, অনাহার, অনটন আর ক্ষুধার তাড়নায় ব্যথিত মানুষের জীবন-কাহিনি। লেখকের জন্মস্থান কুড়িগ্রামের নদী, মানুষ, গ্রাম, মাঠ, বন সমগ্রজীবন নিয়ে জলেশ্বরীর ভুবন গড়ে উঠেছে। তিস্তা, ধরলা বিধৌত জলেশ্বরীর বহমান জীবনপ্রবাহ রূপায়ণে লেখক ঐ অঞ্চলের লোকশ্রুতি, কিংবদন্তি, উপকথা, ব্রতকথা যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি অলঙ্কার প্রয়োগেও গ্রামীণ আবহ ফুটে উঠেছে। যেমন :

উপমা : আজহার যেন এক বৃক্ষ, সে উদ্ভিদ হয়ে আছে। (আজাহারের মাতৃশোক)

উৎপ্রেক্ষা : মফস্বলে মানুষের ব্যক্তিগত ইতিহাস আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত আম আঁটির মতো হঠাৎ একদিন পাতা ছাড়ে, গোপন থাকে না। (জলেশ্বরীর দুই সলিম)

প্রতীক : লেখক 'নিয়ামতকে নিয়ে গল্প নয়' গল্পে অবরুদ্ধ সামরিক শাসনামলের অবস্থা ফাটল ধরা পুকুরপাড় ও সাপের প্রতীকে উপস্থাপন করেছেন :

> বিমল আর আমি, আর এই ফাটল ধরা পুকুর পাড়, এই অন্ধকার, এই সাপের ভয়, আমরা সমস্ত কিছু নিয়ে এবং জড়িয়ে বসে থাকি, আমরা কখন যেন আমাদেরই জীবনের গল্প করতে শুরু করি এবং চকিত হয়ে আবিষ্কার করি, যেন মান্নানরা এখন এই পুকুর পাড়ে উপস্থিত নেই, তবু আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে ভয় পাচ্ছি।

আঞ্চলিক ভাষা : লেখক রংপুর আঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় পাত্র-পাত্রীর সংলাপ নির্মাণ করেছেন :

(ক) না, না, সেলিম নয়, নিজ চক্ষে মুঁই সলিমকে দেইখঁছো। (জলেশ্বরীর দুই সলিম)

(খ) হয়, হয়, বাপো মোর, ডর না করেক চান হামার। (আরো একজন)

প্রবাদ-প্রবচন : লেখক গল্প নির্মাণে লোকায়ত জীবনাচরণে ব্যবহৃত অনেক প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করেছেন। যেমন : মুখের কথাই বল্লম, এ ফোড় ওফোড় হয়ে যাওয়া, আল্লার মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, বাঁধা রাখা, কলা দেখানো, ভোজবাজি দেখানো ইত্যাদি।

জনশ্রুতি/কিংবদন্তি :

সৈয়দ শামসুল হক জলেশ্বরী অঞ্চলের কিংবদন্তি, উপকথা, ব্রতকথা লোকশ্রুতিসমূহ গল্পে তুলে ধরেছেন : কামেল পীরের কথা, বেহেশতের জ্বিন, সিপাহী যুদ্ধের শ্রুতি, আজহারের বৃক্ষে পরিণত হওয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব ইত্যাদি। যেমন : 'শরবতির পাশ ফেরা' গল্পে কুতুবউদ্দিন আউলিয়ার মাজারে বিবস্ত্র শরবতিকে শায়িত দেখে অনেকে তাকে কামেল তাপসী সাধক ভেবেছে। কেননা জনশ্রুতি আছে বহু সাধকেরা এভাবে পাগল বেশে দেখা দেন। 'প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান' গল্পে পিপাসার্ত পথিককে ইদ্রিস খাঁ নয় বেহেশতি জ্বিন রূপার গ্লাসে জল খেতে দিয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে। 'জমিরুদ্দিনের মৃত্যু বিবরণ' গল্পে লোকশ্রুতি আছে যে, জমিরুদ্দিন বসুনিয়ার পূর্বপুরুষ সিপাহী যুদ্ধের সময় ইংরেজদের দ্বারা এই অঞ্চলের খাজনা আদায়ের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। ফলে গ্রামবাসীরা তাদের পরিবারকে ঘৃণা করত। 'আজহারের মাতৃশোক' গল্পে আজহার বৃক্ষে পরিণত হলে দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসত তাকে দেখার জন্য।

জলেশ্বরীর গল্পগুলোতে আছে লেখকের ইতিহাসমনস্কতা, সমাজ ও সমকালের জিজ্ঞাসা। সৈয়দ শামসুল হক রচিত গ্রামীণ জীবনধারার গল্পগুলো যদিও বিশেষ একটি অঞ্চলের পাত্র-পাত্রীর জীবনের রূপায়ণ তবুও তাতে সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতা ফুটে ওঠে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> জলেশ্বরীর ভূগোলে লেখক চিত্রিত করেছেন তাঁর জন্মস্থান স্মৃতিময় কুড়িগ্রামের বিভিন্ন জনপদকে। জলেশ্বরীর অনুষঙ্গে কখনো বা প্রতিফলিত হয়েছে সমগ্র বাংলাদেশের মানচিত্র। এক আবেগঘন গীতল দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক কুড়িগ্রাম তথা জলেশ্বরীর ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং জলেশ্বরীর মানুষের দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম, সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার গৌরবগাঁথা চিত্রিত করেছেন। জলেশ্বরীর নানা ক্ষুদ্র জনপদ মান্দারবাড়ি, ভেলাকোপা, কাঠালবাড়ি, হাওরার হাট, উলিপুরে, রাজারহাট এবং জলেশ্বরীর সীমান্তবর্তী ভারতের কুচবিহার, দীনহাটা, আসাম প্রভৃতি স্থান এই পর্যায়ের গল্পগুলোতে তৈরি করেছে ভৌগোলিক সীমানা।[২০]

সৈয়দ শামসুল হক সমাজের রক্ষণশীল, সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী, মৌলবাদীশ্রেণি, সুবিধাবাদী শ্রেণি, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী, অসাধু রাজনীতিবিদ ও মহাজন এদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। এ ক্ষেত্রে বলা যায়, সমাজ বদলের আকাঙ্ক্ষা লেখক প্রত্যাশা করেছেন। গ্রামের নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীনদের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। 'জলেশ্বরী অঞ্চলের প্রতি প্রবল ভালোবাসা তাঁকে গ্রামীণ ঐতিহ্যের দিকে নিয়ে যায়। তিনি তাঁর গল্পগুলোতে সাধারণ মানুষের জীবনের গান গেয়েছে। দুঃখ আর নিপীড়নের সঙ্গে যে জীবন বাঁধা তার প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে।'[২১] তাঁর গল্পে সমাজবোধ ও মানবিক সম্পর্কের বিষয়টি উপস্থাপনে তিনি সর্বদা সচেষ্ট।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. সৈয়দ শামসুল হক, 'প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান', *গল্পসমগ্র* (ঢাকা : অনন্যা প্রকাশনী, ২০১৭), পৃ. ২০৮ [আলোচ্য প্রবন্ধে গল্পের মূলপাঠ উক্ত গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।]
২. আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬), পৃ. ২৪৭
৩. মোস্তফা তারিকুল আহসান, *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮), পৃ. ৪০৮
৪. চঞ্চল কুমার বোস, *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৯), পৃ. ২১০
৫. আহমদ মোস্তফা কামাল, 'সৈয়দ হকের গল্প:জীবন ও পৃথিবীর চেনা-অচেনা বহু বর্ণিল আলো', *জলেশ্বরীর যাদুকর*, শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত (ঢাকা : কথা প্রকাশ, ২০১৫), পৃ. ২৭০
৬. বাংলা*দেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, পৃ. ২১২
৭. জাকির তালুকদার, 'সৈয়দ শামসুল হক : কথা সাহিত্যের পরিব্রাজক', *জলেশ্বরীর জাদুকর*,পূর্বোক্ত পৃ. ২৭৯
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৯. *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, পৃ. ২১৪
১০. হাসান আজিজুল হক, *কথাসাহিত্যের কথকতা* (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪), পৃ. ২৭
১১. চঞ্চল কুমার বোস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩-২১৪
১২. তদেব, পৃ. ২৫২
১৩. তদেব, পৃ.২১৩
১৪. *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, পৃ. ২৫৩
১৫. চঞ্চল কুমার বোস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১
১৬. *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম*, *পৃ ৪০৭*
১৭. আহমদ মোস্তফা কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
১৮. *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, পৃ. ২১৩
১৯. মাহবুব আজীজ, 'চিরস্নিগ্ধ এক বাতিঘর ', *জলেশ্বরীর জাদুকর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
২০. *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, পৃ. ২৫২
২১. *বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, পৃ. ২৪৯